লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়, তা ক্রমে ব্যাপক আকার ধারণ করে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া শিক্ষাজগতেও প্রতিফলিত হয়। ছাত্ররা দলে দলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়; অপর পক্ষে সরকারের দমননীতিও নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই নবজাগ্রত ভারতের শিক্ষিত সমাজ শাসক সম্প্রদায়ের সব নীতি বিনা বিচারে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কার্জনের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। কার্জনের ভারত ত্যাগের পর সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়; কিন্তু কার্জনের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে জনগণের অসন্তোষ থেকেই যায়; আর তার সঙ্গে যুক্ত হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই উভয়দিকের চাপ কমানোর জন্য বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের পূর্বেই ইংরেজ সরকার পর্যায়ক্রমে কিছু প্রশাসনিক সংস্কার ও কিছু শিক্ষাসংস্কারের প্রয়াস করেন। এই সময়ে প্রশাসনিক দিক থেকে অন্ততঃ পক্ষে দুটি ভারত শাসনসংস্কার আইন পাশ হয়—1909 সালে মর্লে-মিন্টো আইন এবং 1919 সালে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইন। এদের মধ্যে দ্বিতীয় আইন বলে দ্বৈত শাসননীতি প্রবর্তিত হয়। অন্যদিকে, শিক্ষাক্ষেত্রেও সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা করা হয় যেমন—1913 সালে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, 1917 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয়। এ ছাড়া সাইমন কমিশনের উপসমিতি হিসেবে হার্টগ কমিটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত এক গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করেন 1929 সালে। কারিগরি বা বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত উড্-এবট্ (Wood-Abbot Report) রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 1937 সালে। পাশাপাশি ঐ একই সময়ে 1937 সালে এক সর্বভারতীয় শিক্ষাসম্মেলন হয় গান্ধীজীর সভাপতিত্বে, যেখানে তাঁরই প্রস্তাবিত বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কার্যকরী রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ধায় এই সম্মেলন সংঘটিত হয়েছিল বলে, পরবর্তী কালে এই বুনিয়াদী পরিকল্পনার কাঠামোকে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে তিরিশের দশকের শেষ পর্যন্ত

এই সব ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা বিশেষভাবে তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো সংস্কারমূলক চেষ্টা হিসেবে। এগুলি হল—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের' সুপারিশসমূহ, 'উড্-এবট্ (Wood-Abbot) রিপোর্টের সুপারিশসমূহ এবং গান্ধীজী প্রস্তাবিত 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা'। এই সব সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার কতটুকু গুণগত বা পরিমাণগত উন্নয়ন হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল'। কারণ, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। তবে এই সব উন্নয়ন প্রচেষ্টা শিক্ষার ভারতীয়করণের (Indianisation) প্রয়াসে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই আমরা এখানে নির্বাচিত তিনটি অংশ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো।

(এক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (1917-19) বা স্যাডলার কমিশন

[Calcutta University Commission (1917-19) or, Sadler Commission]

কমিশন গঠন

1904 সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়েছিল, লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায়। ঐ আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হলেও সামগ্রিকভাবে তা শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে সন্তুষ্টি আনতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সাফল্যজনক প্রচেষ্টাও সরকারের দিক থেকে ঐ সময় দেখা যায়নি। তা ছাড়া, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। 1913 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবেও বলা হয়েছিল সমগ্র ভারতে 5টি বিশ্ববিদ্যালয় ও 185টি কলেজ উচ্চ-শিক্ষা প্রসারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষণ দু'ধরনের কাজেরই ব্যবস্থা করার দরকার। এ ছাড়া এই শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে উচ্চ-শিক্ষা সম্পর্কে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল। কিন্তু সরকার স্থির করেন, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ না নিয়ে ঐ প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা হবে না। অন্যদিকে যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করা হয় 1910 সালে গঠিত এক রয়েল কমিশনের সুপারিশ-ক্রমে। ফলে, ভারত সরকারের পক্ষে স্থানীয় চাপ সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (1904) পাশ হওয়ার দশ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। 1914 সালে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য লর্ড হলডেনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হল। এই লর্ড হলডেন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কার প্রসঙ্গে রয়েল কমিশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু, তিনি ভারতে আসতে রাজী হলেন না; ইতিমধ্যে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ফলে, ভারতে শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা স্থগিত হইল। 1917 সালে মহাযুদ্ধের অবস্থা অনেকাংশে অনুকূলে আসায়, শিক্ষাসংস্কারের দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ ঘটলো। এই বছর (1917) ভারত সরকার ইংলন্ডের লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি করে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন" নিয়োগ করেন। এই কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার জিয়াউদ্দীন আহমদ, ডঃ গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ হার্টগ, অধ্যাপক র‍্যামজে মুর। কমিশনের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নামানুসারে এই কমিশন "স্যাডলার কমিশন" হিসেবেই সমধিক পরিচিত।

কমিশনের বিচার্য বিষয়

ভারত সরকার কমিশনকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছে—"কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবে, ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনাগুলি বিচার বিবেচনা করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য গঠনমূলক নীতি গ্রহণের সুপারিশ করবে (To enquire into the condition and prospects of the University of Calcutta and to consider the question of a constructive policy, in relation to the problems which it presented)। অর্থাৎ, খুবই সাধারণ ভাষায় কমিশনকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থা তিনটি দিক থেকে বিচার করতে বলা হয়েছিল—(**এক**) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সমস্যাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে; (**দুই**) ঐ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সেই বিষয়ে পরামর্শ দিতে এবং (**তিন**) কোন কোন দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে উপযুক্ত সুপারিশ করতে। কমিশনের কর্মপরিধিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও কমিশনের সদস্যরা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে সমগ্র ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কিভাবে সংস্কার করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং সুপারিশসমূহ পেশ করেছেন। কমিশনের বিচার্য বিষয় প্রসঙ্গে আর একটি দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিক্ষা' বলতে কেবলমাত্র উচ্চ-শিক্ষা বা কলেজীয় শিক্ষাকে বোঝাতো না। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভারও তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাবলীও স্বাভাবিক নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, তাঁর সমস্যাবলী পর্যালোচনার পর কিছু সুপারিশ করেছিলেন। আমরা এখন এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির উল্লেখ করবো।

স্যাডলার কমিশনের সুপারিশসমূহ
(Recommendations of Sadler Commission)

সূচনা

স্যাডলার কমিশনের সদস্যরা দীর্ঘ সতের মাস পর 1919 সালে তাঁদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। সারা ভারত ঘুরে ছোট-বড় বহু প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করে, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কমিশন শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনা সম্বলিত রিপোর্ট রচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় বলে, কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া, শিক্ষার অন্যান্য সকল স্তরেরই আলোচনা, এই রিপোর্টে স্থান পেয়েছিল। তাই এই স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট কয়েকটি খণ্ডে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে এরকম প্রয়োজনীয় ও সুদীর্ঘ রিপোর্ট এর আগে কখনও তৈরী হয়নি। রিপোর্টে সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা হলেও, বঙ্গদেশের শিক্ষা সমস্যার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ হয়তো কমিশনের বিচার্যক্ষেত্র, কিন্তু অনেকে মনে করেন, এ ব্যাপারে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত প্রভাব কাজ করেছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ

কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নটি অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। কমিশন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বঙ্গদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার সার্থক হবে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার সাফল্য মাধ্যমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং প্রশাসনিক দিক থেকে তারা এক সঙ্গে আবদ্ধ। তাই কমিশন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান ত্রুটিগুলির কথা উল্লেখ করেন—(১) সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার মান নিম্নগামী; (২) প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করে। অন্যদিকে সরকারী শিক্ষাবিভাগও তাদের বিধি নিষেধের জালে মাধ্যমিক শিক্ষাকে আবদ্ধ করে রাখে। এই ধরনের দ্বৈত-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় না। পরস্পর বিরোধী এই নিয়ন্ত্রণের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। (৩) কমিশন বঙ্গদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কষ্টসহিষ্ণুতা, জ্ঞানপিপাসা ও ত্যাগের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, বহু শিক্ষার্থী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অক্ষম হচ্ছে। (৪) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হয় তা খুবই সামান্য। এই স্বল্প বেতনে ভাল শিক্ষক জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই পঠন-পাঠনের মানও খুব নিম্নস্তরের। তা ছাড়া, যে সব শিক্ষকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের বেশীর ভাগেরই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। (৫) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির আর্থিক অবস্থাও খুব করুণ। মূলতঃ অর্থের অভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে

না। শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পথে আর্থিক বাধাই প্রধান অন্তরায়। (ছ) মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্তাধীন হওয়ায় এই শিক্ষা তার যথাযোগ্য গুরুত্ব যেটুকু পাওয়া উচিত তা পাচ্ছে না। এই ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বাড়তি আয় হয় ঠিকই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে উচ্চশিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাস্তরের দায়িত্ব থাকায়, মাধ্যমিক শিক্ষাও যেমন মোটেই অগ্রসর হতে পারেনি, তেমনি উচ্চ-শিক্ষাও যথেষ্ট অবহেলিত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে তার এই দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য কমিশন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। কমিশনের এই সুপারিশগুলি আধুনিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি হল—[ক] মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা সরকার না করলে কোন সংস্কার প্রচেষ্টাই কার্যকর হবে না। এজন্য সরকারী তহবিল থেকে বিশেষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত 40 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হবে। [খ] কমিশন মন্তব্য করেছেন, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা যথোচিত না হলে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবে এবং তার গুণগত মানও ক্রমশঃ নিম্নমুখী হবে। কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুপারিশ করেছিলেন যে, এই শিক্ষক-শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে, স্নাতক স্তরে সাধারণ পাঠক্রমে "শিক্ষা" কে (Education) একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ পাঠক্রম রচনার পরামর্শও দিয়েছিলেন। (গ) মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের জন্য কমিশন কতকগুলি সুপারিশ করেন, তার মধ্যে প্রথম হল—মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এই ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষা উভয়েই উপকৃত হবে। (ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনে কমিশন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন, যেহেতু কলেজে প্রথম দু'বছরের পাঠ অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ, তাই ঐ অংশটুকুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে সরিয়ে এনে, মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, দু'বছরের 'ইন্টার মিডিয়েট' শিক্ষা হবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেরই অঙ্গ। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দুটি পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে—প্রথমটি দশম শ্রেণীর পাঠ শেষ করার পর, অর্থাৎ, 'ম্যাট্রিকুলেশন' এবং দ্বিতীয়টি ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ, আরো দু'বছর প্রাক বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ শেষ করার পর। এই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কোন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হবে না। (ঙ) দু'বছরের বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার জন্য এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। যাদের বলা হবে "ইন্টারমিডিয়েট কলেজ" (Intermediate College)। এক্ষেত্রে 'কলেজ' কথাটি একটু বিভ্রান্তিকর। কারণ কলেজীয় শিক্ষা বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই বোঝায়। কিন্তু কমিশন এই শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বাইরে